ইউটোপিয়ার নৃবিজ্ঞান

The Anthropology of Utopia

অনুবাদকের ভূমিকা

ইউটোপিয়ার স্বপ্ন মানুষ সব সময়ই দেখে এসেছে। প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ থেকে বর্তমানের শিল্পায়িত কিংবা শিল্প-উত্তর সমাজের মানুষও নিজেদের মতো করে একটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময়, অভাবমুক্ত সমাজের কথা ভেবে চলেছে। তবে ইউটোপিয়া বলতে কী বোঝাবে, একটা সুস্থ, সুন্দর সমাজের সংজ্ঞাই বা কী হবে; ধারণাগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, সার্বিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের ফলে পালটাতে থাকে। একুশ শতকে এসে ইউটোপিয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তায় পরিবেশ, প্রতিবেশ, আর্থ-রাজনৈতিক বৈষম্য ও সহিংসতাসহ নানান বিষয় বিবেচনায় নিতে হচ্ছে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে ইউটোপিয়ার গঠন, কাঠামো, গতিপ্রকৃতি কীরকম হতে পারে? আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার যেসব বিষয় আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে মেনে নিয়েছি, সেগুলোর কোন ধরনের রূপান্তর প্রয়োজন? ব্যক্তির ও সমষ্টির চিন্তাভাবনা, আদর্শ ও নৈতিকতাবোধে কোন ধরনের পরিবর্তন আসা দরকার? এই জায়গাগুলোতে নৃবিজ্ঞানেরই-বা ভূমিকা কীরকম? ড্যানিয়েল চডোরকফের বইটা এই বিষয়গুলো নিয়েই কিছু কথা বলতে চায়, রাখতে চায় কিছু প্রস্তাবনা। তাঁর চিন্তাগুলো কোনো নীলনকশা, বা পুঙ্খানুপুঙ্খ দিকনির্দেশনা নয়; সেগুলো এমন কিছু বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা তুলে ধরতে চায় যেগুলো প্রকৃতি, মানুষ, উন্নয়ন ও প্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণাকে আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের চেষ্টা করে।

চডোরকফের এই বইটা পুঁজিবাদী অর্থনীতি, কর্তৃত্ববাদী শাসন, প্রতিবেশগত বিপর্যয়, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মতো সংকটের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলে। অন্যদিকে তা স্ব-নির্ভরতা, আর্থ-রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ, পরিবেশগত ভারসাম্য বিধান ও জ্বালানির বিকল্প প্রযুক্তিসহ নানা ধরনের বিকল্প ও সম্ভাবনার পর্যালোচনাও তুলে ধরে। তাঁর মতে ইউটোপিয়ার জন্য একদিকে যেমন বস্তুগত ভিত্তি গড়ে তোলা প্রয়োজন, একই সঙ্গে প্রয়োজন নৈতিকতাবোধের রূপান্তর। এ কারণে চডোরকফ একটি 'নতুন আলোকময়তা'র আহ্বান জানান। আঠারো শতকের ইউরোপে ঘটে যাওয়া আলোকময়তার দোষত্রুটি বিবেচনা করেই তিনি বলতে চান, পূর্বের আলোকময়তা যেভাবে অতীতে ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সংক্রান্ত যাবতীয় চিন্তাভাবনা ভেঙে ফেলে সৃষ্টি করেছিল নতুন আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক আবহ, নতুন আলোকময়তাকেও এ রকমের একটা কাজই করতে হবে। এরূপ একটি নৈতিক পুনর্গঠনের মধ্যে থাকতে হবে সমাজ, প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়বোধ ও গভীর আত্ম-সচেতনতা।

পুরো লেখার মধ্যে বারবার সমষ্টিগত ও সামাজিক বন্ধনের ওপর জোরারোপ করা হয়েছে। পুঁজিবাদের সার্বিক সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয় তৃণমূল পর্যায় থেকে। এখানে চডোরকফ এক প্রকারের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কথা বলেন, যার ভিত্তি হবে পাড়া, মহল্লা ও নিকটবর্তী সমষ্টি তথা কমিউনিটি। লেখক যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের লোইসাইডা নামক একটি মহল্লার এথনোগ্রাফি তুলে ধরেন। এই বিবরণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেন কীভাবে একটা মহল্লার মানুষ একত্রিত হয়ে পুঁজিবাদের শোষণমূলক, সহিংস কাঠামোর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং এই ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে তারা কীভাবে নিজেদের পালটা কাঠামো নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিল। এই মহল্লার মানুষেরা কোনো ধরনের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাজন বা হায়ারার্কির মধ্যে না গিয়ে সংঘবদ্ধভাবে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করত। পাশাপাশি তারা তৈরি করেছিল নতুন কিছু উৎপাদন প্রক্রিয়া ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা তাদের অনেকাংশেই স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সহায়তা করেছিল। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বেরিয়ে এসে এখানকার দরিদ্র মানুষেরা নবায়নযোগ্য বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের নকশা প্রণয়ন করতে পেরেছিল, যা আজও শহুরে

প্রেক্ষাপটে একটা মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে। বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো ও তাদের সব ধরনের 'সাহায্য'কে নাকচ করে দিয়ে একটা মহল্লা যে তাদের খাদ্য সংকট, বাসস্থানের সংকট, বৈষম্যসহ সব ধরনের সংকট মোকাবিলা করতে সমর্থ তা উপলব্ধি করার জন্য এই এথনোগ্রাফিক কেস স্টাডি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৭০-এর দশকের লোইসাইডার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বর্তমান যুগের যেকোনো শহুরে বাস্তবতার বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু এই মহল্লার মানুষের নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা যেভাবে জলবায়ুগত, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়েছিল, তা আজও অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সামগ্রিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে চডোরকফ বিশেষ গুরুত্ব দিতে চান; তিনি আহ্বান জানান নৃবিজ্ঞানকে পুনর্গঠিত করার। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের বলে, এই জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ভবের সঙ্গে ঔপনিবেশিক, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নৃবিজ্ঞানীরা শাসক ও দখলদার গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য করে গিয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে নৃবিজ্ঞানী, নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি/ডিসকোর্স ও নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি একে একে প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া শুরু হয় এবং নৃবিজ্ঞানের নৈতিক ও পেশাগত অবস্থান যাচাই করা হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নৃবিজ্ঞান পড়ানোর সময় ঔপনিবেশিক আমলে নৃবিজ্ঞানীদের বর্ণবাদী, ইউরোকেন্দ্রিক তত্ত্বের সমালোচনার পাশাপাশি তাদের নৈতিকতা বিবর্জিত নানা কর্মকাণ্ডের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়। কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে পেশাদার নৃবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রীয় ও কর্পোরেট পুঁজির সঙ্গে যেভাবে মিলেমিশে কাজ করে যাচ্ছে সে ব্যাপারে কোনো সমালোচনা তো এই পাঠ্যক্রমে থাকেই না, বরং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিভিন্ন এনজিও ও সরকারি প্রকল্পে নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের কাজ করার ব্যাপারে আরও উৎসাহিত করা হয়। উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক পশ্চিমা ধ্যানধারণা থেকে এককালের উপনিবেশ ও আজকের "তৃতীয় বিশ্বে"র মানুষেরা যেন মুক্ত হতেই পারছে না। আঠারো-উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদে যা ছিল 'শ্বেতাঙ্গ মানুষের দায়' (white man's burden) তা এখন হয়ে উঠেছে প্রথম বিশ্বের দায়। যেখানে তৃতীয় বিশ্বের অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত মানুষদের

রক্ষা করা যেন ধনী দেশগুলোর দায়িত্ব। একুশ শতকে এসে এ ধরনের চিন্তাধারা ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স ও মনস্তত্ত্বেরই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। নৃবিজ্ঞানীরা এক অর্থে তাদের পুরানো অপকর্মগুলোরই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। পেশাগত ও একাডেমিক নৃবিজ্ঞানের এই সংকট একদিকে যেমন কিছু একাডেমিক ট্রেন্ডের অংশ, অন্যদিকে তা বৈশ্বিক পুঁজিবাদী অবস্থার সঙ্গেও সম্পর্কিত। ঔপনিবেশিক আমলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের জন্য তথ্য সংগ্রাহক দালাল হিসেবে নৃবিজ্ঞানীরা কাজ করত, বর্তমানের নৃবিজ্ঞানীরা বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে পরোক্ষ ভূমিকা রেখে খানিকটা অন্যভাবে দালালের কাজই করে যাচ্ছে। এক প্রকারের পরজীবিতা ছেড়ে তারা বেছে নিয়েছে অন্য আরেক ধরনের পরজীবিতাকে।

সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে ইউটোপিয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার প্রকল্পকে লেখক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত একটা প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে চান। চডোরকফের মতে, আমরা বর্তমানে যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত তা একদিকে যেমন পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন ও বলবৎ করার জন্য গড়ে তোলা সংস্কৃতিকে ক্রমাগত পুনরুৎপাদনের চেষ্টা করে, অন্যদিকে এই ব্যবস্থা একটা 'গোপন পাঠ্যক্রমে'র মধ্য দিয়ে মানুষকে শেখায় ক্ষমতা কাঠামোর অনুগত হতে, প্রশ্ন না করে আদেশ-নির্দেশ মেনে নিতে। এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয় এমন একটা সমাজ, যেখানে মানুষ মনে করতে থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলো অলঙ্ঘনীয় এবং সেগুলোকে কোনো ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন না করে পালন করে যাওয়াটাই একজন 'সুনাগরিকে'র কাজ। এই ধরনের প্রথাগত শিক্ষার বদলে চডোরকফ প্রস্তাব করেন একটি র‍্যাডিকাল শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে মানুষকে প্রশ্ন করতে শেখানো হবে, আনুগত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে অনুসন্ধিৎসা ও সৃষ্টিশীলতা। কারণ একটা সুস্থ সমাজ তৈরি করতে হলে তা শেষ পর্যন্ত চিন্তাশীল, শান্তিপ্রিয় মানুষের সমষ্টির দ্বারাই হবে।

একটা ইউটোপিয়ার নির্মাণের জন্য পরিবেশ (environment) ও প্রতিবেশের (ecology) দিকে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ের জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ বিবিধ সংকট মোকাবিলার জন্য একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন এমন একটা সমষ্টিগত নৈতিকতাবোধ/মূল্যবোধ সৃষ্টি

করা, যেখানে মানুষ ও তার সামগ্রিক সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা হবে প্রকৃতির অংশ হিসেবে, হর্তাকর্তা হিসেবে নয়। নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই সম্ভব প্রকৃতির ওপর চলমান ধ্বংসযজ্ঞ থামানো এবং প্রকৃতি ও মানুষের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা।

ইউটোপিয়ার স্বপ্ন অনেক পুরানো। মানব সমাজের সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ এমন একটা সমাজের স্বপ্ন দেখে আসছে যেখানে কোনো অভাব, সহিংসতা, বৈষম্য, শোষণ থাকবে না। অতীতের অন্য সময়গুলোতে এটা বাস্তবায়ন করার কোনো বস্তুগত ভিত্তি না থাকলেও এখন তা সম্ভব। পৃথিবীর সব মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান দেওয়া, তার যথাযথ বাসস্থান ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এখন মানব সভ্যতার হাতে রয়েছে। যা নাই তা হলো এমন একটা সমাজকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা। ইউটোপিয়া বলতে সাধারণ অর্থে যা বোঝানো হয়, সেসব ধারণার সঙ্গে বেশিরভাগ মানুষেরই দ্বিমত থাকবে না। দ্বিমত পোষণের জায়গাটা শুরু হয় এমন একটা সমাজের সম্ভাব্যতার কথা ভাবতে গিয়ে; বেশির ভাগ মানুষই মনে করে এমন একটা সমাজ অসম্ভব। আমাদের তাই শুরু করতে হবে এই মৌলিক জায়গা থেকেই। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আগে আমাদের বোঝাতে হবে যে, আরেকটা জগৎ সম্ভব। ইউটোপিয়া কোনো আকাশকুসুম স্বপ্ন নয়, তা উদ্ভ্রান্ত কিছু মানুষের প্রলাপও নয়, বরং একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে তা মানুষের নাগালেই আছে। এই ইউটোপিয়া নির্মাণের কাজ আমাদের শুরু করতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে, একেবারে পাশের মানুষটার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে। মহল্লায় আমাদের প্রতিবেশী ভালো আছে কি-না সেই খোঁজখবর নেওয়ার মাধ্যমে।

আনন্দ অন্তঃলীন
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৫

সূচি

ভূমিকা	১৫
সামাজিক বাস্তবিদ্যা এবং সমষ্টি উন্নয়ন	২৬
উন্নয়নের পুনঃসংজ্ঞায়ন	৪৫
একটি পুনর্গঠনমূলক (Reconstructive) নৃবিজ্ঞানের অভিমুখে	৬১
ইউটোপীয় আবেগ	১৩৬
সামাজিক বাস্তবিদ্যা : একটি প্রতিবেশগত মানবতাবাদ	১৬১
সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা	১৭৬
মহল্লার দখল নাও	১৯১
নির্ঘণ্ট	২০৫

ভূমিকা

আমরা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। খনিজ জ্বালানি এবং মাটি, পানি, বায়ুমণ্ডল ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থের ওপর আমাদের নির্ভরতা থেকে নিস্তার পেতে চাইলে নীতি প্রণয়নের চেয়েও বেশি কিছু প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন নতুন প্রতিষ্ঠান ও মানবিক সম্পর্ক গঠনের ওপর জোরারোপ, যা আমাদের এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। কীভাবে আমরা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক পুনরায় সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারি? কীভাবে সম্ভব একটি প্রতিবেশগত সমাজ (ecological society) নির্মাণ করা?

এই মৌলিক প্রশ্নসমূহ কেন্দ্রে রেখেই এ বইয়ের লেখাগুলো তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি সামাজিক বাস্তবিদ্যা (social ecology) আমাদের এমন কিছু ধারণার সঙ্গে পরিচিত করায়, যেগুলো বর্তমানের নানান সংকটের একটি যথাযথ প্রত্যুত্তর তৈরিতে আমাদের সাহায্য করবে। এই জ্ঞানকাণ্ড কেবল সমাজের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পালটানোর কথাই বলে না, একই সঙ্গে এমন একটি নতুন চেতনা সৃষ্টির কথাও বলে যা মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্গত সম্পর্কের একটি ভিন্ন বোঝাপড়ারও ইঙ্গিত দেয় এবং 'প্রকৃতিকে' পুনঃসংজ্ঞায়িত করে। এ রকম একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের চিন্তা

বৈশ্বিক পর্যায়ে বিদ্যমান শ্রেণিবিভাজন, আধিপত্য ও শোষণের প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। সামাজিক বাস্তবিদ্যা মনে করে, এসব নতুন প্রতিষ্ঠান এবং মানবীয় ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলা একই সঙ্গে সম্ভব ও অত্যাবশ্যক।

এমনটা চিন্তা করা কি খানিকটা বাড়াবাড়ি? হয়তো। কিন্তু নৃবিজ্ঞানী হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে, এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিই, সেসব বাস্তবে আমাদের নির্দিষ্ট সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত। সেগুলো একটি ঐতিহাসিক ধারা থেকে উৎপন্ন এবং সেসব আমাদের লোভ, প্রতিযোগিতা, আগ্রাসন ও আধিপত্যের (যে বিষয়গুলোকে "মানবদশার" সহজাত অভিব্যক্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়) ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সম্পর্ককে বাস্তব রূপ দান করে। একটি নতুন প্রাক্সিস (praxis) তৈরি করতে হলে আমাদের "মানবদশার" (human nature) এমন সংকীর্ণ, সংস্কৃতি-ভিত্তিক ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং "মানবীয় সম্ভাবনার" একটি বিস্তৃত বোঝাপড়ার সন্ধান করতে হবে। যে সম্ভাবনাকে দেখা যায় একটি ধারাবাহিকতা হিসেবে, যেখানে নিঃসন্দেহে লোভ, প্রতিযোগিতা, আগ্রাসন ও আধিপত্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান; কিন্তু একই সঙ্গে সেখানে রয়েছে যত্ন, সমবায়, প্রতিপালন এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সংযোগ ঘটার সম্ভাবনা। এই লেখাগুলো মনে করে মানুষের 'বৈশিষ্ট্য' সংক্রান্ত বিদ্যমান চিন্তাধারা, একটি প্রজাতি হিসেবে আমাদের ব্যাপক সম্ভাবনার অল্পকিছু বিষয়কেই সামনে নিয়ে আসে।

এরূপ র‍্যাডিকাল পরিবর্তনের আহ্বান জানানো খানিকটা সরল মনে হতে পারে, সে কারণে একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করতে চাই। আমার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের অধিকাংশই ব্যয় করেছি ইউটোপিয়ার সন্ধানে। এই ইউটোপিয়া কোনো আকাশকুসুম চিন্তা নয়, কোনো ধর্মীয় স্বপ্নের জগৎও নয়; চেষ্টা করেছি বাস্তবসম্মত সম্ভাবনার সঙ্গে বোঝাপড়া চালানোর; একটি ন্যায্য, প্রতিবেশগত সমাজ সম্পর্কে